গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ আগস্ট ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

নার্সদের আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

৬ আগস্ট এসএসকেএমে নার্সদের বিশাল সমাবেশ

বেতন বঞ্চনা অবসানের দাবিতে অবশেষে নার্সেস ইউনিটির আন্দোলন জয়যুক্ত হল। সিপিএম সরকারের সময় থেকে এই আন্দোলন শুরু। কিন্তু ওই সরকার দাবি মানেনি। তৃণমূল সরকারও দীর্ঘকাল উপেক্ষা করেছে। অবশেষে দাঁতে দাঁত চেপে ২৬ জুলাই থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন ১২ দিনের মাথায় দাবি ছিনিয়ে নিল। নার্সিং আন্দোলনের ইতিহাসে এই জয় ঐতিহাসিক।

৬ আগস্ট কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল পরিণত হয়েছে আন্দোলনের কেন্দ্রে। যতদূর চোখ যায় শুধু মাথা আর মাথা। সাদা অ্যাপ্রন পরে হাজার হাজার নার্সিং অফিসার স্লোগান তুলছেন, বক্তব্য রাখছেন। উপেক্ষা আর অবজ্ঞা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে তাঁদের। তাঁরা এসেছেন তাঁদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিকারের দাবিতে। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা করে নয়, রোগী পরিচর্যা সহ যাবতীয় কাজ সেরেই তাঁরা নানা জেলা থেকে এসেছেন সংগ্রামী সংগঠন নার্সেস ইউনিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলনে যোগ দিতে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

সিঙ্গুর নিয়ে চোখের জল আসল সঙ্কট চাপা দিতেই

হঠাৎই সিঙ্গুর আবার সংবাদপত্রে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। আলোচনার সূত্রপাত শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। ২৬ জুলাই পিটিআইকে দেওয়া এক স্বাক্ষাৎকারে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের কোনও বিরোধ নেই, সিঙ্গুর কাণ্ডের জন্য টাটাদের দায়ী করা চলে না। তিনি আরও বলেছেন, দোষ তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের, যারা গা-জোয়ারি করে কৃষকের জমি দখলে নেমেছিল।

এই সাক্ষাৎকারের পরই রাজ্যের একটি প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে কিছু প্রশ্ন তুলেছে। সম্পাদকীয়তে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ও বিরোধী আন্দোলনকারী উভয়ের সমালোচনা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে বলেছে, 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০' এর দম্ভে, রাষ্ট্রের দমন পীড়ন বাহিনীকে ব্যবহার করে কৃষকদের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে দুরমুশ করে দিয়ে, স্বৈরশাসকের কায়দায় যেভাবে ১০০০ একর জমি দখল করা হয়েছে তা চূড়ান্ত নিন্দনীয়। সিঙ্গুর নিয়ে সিপিএমের অবস্থান যে ভুল ছিল, দলগতভাবে তা স্বীকার না করার ফলেই যে সিপিএমের ভোট ব্যাঙ্কের বিপুল ক্ষয়, সম্পাদকীয়তে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে পত্রিকাটির অভিযোগ, সিঙ্গুর আন্দোলন যে সিপিএম সরকারের অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, রাজ্যে শিল্পায়নের বিরুদ্ধে নয়, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। দ্বিতীয়ত, তারা জমি নিতে দেবেন না বলেছেন, জমি অধিগ্রহণের বিকল্প পন্থা বলেননি। পত্রিকাটির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, কোন পথে গেলে রাজ্যে সত্যিই শিল্পায়ন ঘটতে পারে, বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সেই আলোচনায় শাসক পক্ষকে টানতে পারেনি।

এ রাজ্যের মানুষ জানেন, সিঙ্গুর আন্দোলনের সূচনাকারী এবং অন্যতম স্থপতি ছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। অথচ সম্পাদকীয়তে তার কোনও উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন যে আদৌ শিল্পায়নের বিরুদ্ধে নয়, তা গোটা সিঙ্গুর আন্দোলনের পর্ব জুড়ে এস ইউ সি আই (সি) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বহুবার বলেছে এবং এ কথাও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছে, সিঙ্গুরে সিপিএম সরকার যা করছে তা আদৌ শিল্পায়ন নয়। শিল্পায়নের নামে বহুফসলি কৃষিজমি দখল করে রিয়েল

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা এসেছে গণমুক্তি আসেনি

১৫ আগস্ট দিনটি ভারতবাসীর আবেগের তন্ত্রীতে আজও ঢেউ তোলে। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের স্বপ্ন আজ কোথায় হারিয়ে গেছে! তবু আজও নানা অনুষ্ঠান হয়, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ মিশে থাকে তার সাথে। ক্ষমতার মসনদের চারপাশে ঘোরাফেরা করা নেতারাও সমারোহে মাতেন, ভাষণ দেন। জনগণ শোনে, আর ভাবে এ কেমন স্বাধীন ভারত— যেখানে ৭৫ বছর পরেও স্বাধীনতা দিবস পালনের অছিলায় কেউ কাঙালি ভোজনের ডাক দিলে হামলে পড়ে শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ! এই বছর ৭৫তম পালনের জন্য জনমনের আবেগকে পুঁজি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নেমে পড়েছেন দেশপ্রেমের ডালি নিয়ে।

৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সাম্প্রতিক ভারতকে একটু দেখা যাক— **দৃশ্য এক ঃ** হাজার হাজার মানুষ হেঁটে চলেছে, শত শত মাইল। কোনও মা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই ক্ষণিক বিরতি নিয়ে জন্ম দেন এ দেশের ভাবী এক 'নাগরিক'কে। তারপর আবার হেঁটে চলেন তিনি। এদেরই কেউ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তিতে রেল লাইনের উপরই ঘুমে ঢলে পড়ে, দেহগুলো পিষে দিয়ে যায় উন্নয়নের শকট। রেল স্টেশনেই চিরঘুমে নিথর হয়ে যাওয়া মায়ের আঁচল টেনে জাগাবার চেষ্টা করে চলে অবোধ শিশু সন্তান। রাস্তাতেই প্রাণ হারান হাজারের বেশি।

দৃশ্য দুই ঃ করোনা মহামারিতে একটা হাসপাতালের বেড আর সামান্য অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যায় কয়েক হাজার প্রাণ। প্রাণ বাঁচানোর বদলে প্রাণহানির খবর চাপা দিতেই সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের প্রধান নদী গঙ্গা বয়ে নিয়ে চলে হাজার হাজার মানুষের লাশ। রাজধানী দিল্লির আকাশ বাতাস কালো হয়ে থাকে দিনের পর দিন অবিরাম জ্বলতে থাকা সহস্র চিতার ধোঁয়ায়। আর তারই মাঝে প্রবল অহঙ্কারে মাথা তোলে দেশের ৭৫ বছরের স্বাধীনতার সমারোহের প্রতীক বিলাসবহুল প্রাসাদ সারি সেন্ট্রাল ভিস্টা।

দৃশ্য তিন ঃ দেশের মানুষের করের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে একচেটিয়া মালিকদের কাছে বেচে দেয় সরকার। বেকারত্বের হার পৌঁছে যায় ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ডকে ছাপিয়ে আরও অনেক দূর। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে, রোজগারের সামান্য সুযোগটুকুও হারিয়ে নতুন করে যোগ দেয় পথের ভিখারির দলে। প্রিয়জনের জীবন বাঁচাতে সামান্য চাল-গম-ছোলার ছাড়পত্র একটা রেশন কার্ডের আশায় কেন্দ্র-রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের পায়ে হুমড়ি খেয়ে আবেদন জানায় 'স্বাধীন' নাগরিক!

দৃশ্য চার, অলিম্পিকে জাতীয় মহিলা হকি দলের খেলোয়াড়ের হরিদ্বারের বাড়িতে চড়াও হয় তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রতিভূরা। দলিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে দিয়ে তারা অনুসরণ করে আজকের ভারতের শাসক দলের হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাকে। রাজ্যে রাজ্যে গো-রক্ষার অজুহাতে অথবা কোনও অজুহাত ছাড়াই সংখ্যালঘু এবং দলিত সম্প্রদায়ের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হিন্দুত্ববাদের স্বঘোষিত অভিভাবকরা মানুষকে হেনস্থা করে চলে, খুন করে। শাস্তি দূরে থাক, খুনিদের সম্বর্ধনা দেয় কেন্দ্রীয় শাসকদল ও সংঘ পরিবারের নেতারা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে যায় ভারতের সমাজ পরিবেশ।

দৃশ্য পাঁচ ঃ আজকের ভারতে প্রতিদিন ৮৮ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন। আরএসএস-বিজেপির অনুসৃত দর্শনের ফরমুলায় নারী আজও পুরুষের অধীন। তাই

দুয়ের পাতায় দেখুন

- **১৫ আগস্ট ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসকে গণমুক্তি সঙ্কল্প দিবস হিসাবে পালন করুন**
- **৯-১৫ আগস্ট সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি সফল করুন**

গণমুক্তি আসেনি

একের পাতার পর

উত্তরপ্রদেশে পুলিশ রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দিতে পারে ক্ষমতাশালীদের দ্বারা ধর্ষিতা এবং খুন হওয়া দলিত সম্প্রদায়ের দরিদ্র পরিবারের কিশোরী কন্যার দেহ। শাসকদলের মন্ত্রী এমএলএ জম্মুতে ধর্ষক-খুনির সমর্থনে মিছিল করে।

দৃশ্যপটের উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, ৭৫ বছরের স্বাধীন ভারতে এ ছবি খুব একটা অপরিচিত নয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে স্বাধীন ভারতের সংসদের প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, 'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি'— নিয়তির অভিসারে এগিয়ে চলেছে ভারত! আজ ৭৫ বছর পরে যে ভারতের চেহারা দেখছি আমরা, তা কোন 'নিয়তি' দ্বারা নির্ধারিত? নাকি ব্রিটিশের বদলে ক্ষমতার মসনদ দখল করা ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির কৃতকর্মের দ্বারা নির্ধারিত? যত দিন যাচ্ছে স্বাধীন ভারতে তত ভরে উঠছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজি মালিকের সিন্দুক, আর নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণ। এ দেশের ১৩০ কোটি মানুষের পরিশ্রমে উৎপাদিত ৭৩ শতাংশ সম্পদ গিয়ে জমা হয় মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিমালিকের সিন্দুকে। এই একচেটিয়া মুষ্টিমেয় মালিক ভোগ করে দেশের ৭৭ শতাংশ সম্পদ। আর দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের হাতে আছে ২ শতাংশের কম। কোন 'ললাট লিখন' ভারতবর্ষকে এই সীমাহীন বৈষম্যের নিদান দিয়েছে?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার নেতৃত্ব স্বপ্ন দেখেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত স্বাধীন ভারতে সাধারণ মানুষই হবে দেশের প্রকৃত মালিক। ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিপ্লবী নেতারা বুঝেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল আত্মসাৎ করতে চলেছে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। তাঁরা দেখেছিলেন কংগ্রেসের আপসমুখী গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে ঘিরে আছে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকরা। তাই তাঁদের বলতে হয়েছিল ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর শোষণমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে আবার একটা সমাজ বিপ্লবের সংগ্রাম করতে হবে। দেখা গেল তাঁদের আশঙ্কাই সত্যি হল, ব্রিটিশের বদলে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতা দখল করল। দেশের মানুষের উপর চেপে বসল বুর্জোয়া শাসন-শোষণের জগদ্দল পাথর। স্বাধীনতার পর বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের সাথে এক ছিল না। বুর্জোয়া শেণি চেয়েছিল, ''দেশ স্বাধীন হবে, তারা সেই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবে। ফলে তেতাল্লিশ কোটি লোকের বাজারে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদকে আরও সংহত করবে এবং মানুষের বুকে জগদ্দল পাথরের মত পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠিত করবে স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দেশোন্নয়নের নামে, দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনার নামে— এই ছিল বুর্জোয়াদের শয়তানি এবং রাজনীতি এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে এই চিন্তা, এই আদর্শ (!) চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই টাকাপয়সা দিয়ে তারা আন্দোলনে সাহায্য করেছিল।''(১৫ আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড) তিনি দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত স্বপ্নকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দেশের মানুষকে সীমাহীন লুঠ করার ব্যবস্থা কায়েম করেছে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। আরও দেখিয়েছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে, আসেনি সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত গণমুক্তি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-র রিপোর্ট দেখাচ্ছে ২০১৪ সালে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক তার শক্তি নিংড়ে ১০০ একক নতুন মূল্য উৎপাদন করলে তার মজুরির ভাগে থাকে মাত্র ৯ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে তা আরও কমে গেছে। উৎপাদিত মূল্যের প্রায় পুরোটাই ঢোকে গিয়ে মালিকের পকেটে। অবশ্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে এটুকুও জোটে না। (আইএলও এশিয়া প্যাসিফিক পেপার সিরিজ ২০১৭, অর্জুন জয়দেব ও অময় নারায়ণের গবেষণাপত্র ২০১৮, আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি) এই হল পুঁজিবাদী শোষণের আসল রূপ। এই পথেই ফুলে ফেঁপে ওঠে পুঁজিপতি শ্রেণি, আর জনগণ ক্রমাগত দারিদ্রের অতল খাদে তলিয়ে যায়। এই ৭৫ বছরের স্বাধীনতা উৎসব করবেন যখন প্রধানমন্ত্রী, ঠিক সেই সময় দিল্লি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন দেশের কৃষকরা। একচেটিয়া কর্পোরেটদের হাতে কৃষি ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে মাসের পর মাস তাঁরা অবস্থান করে চলেছেন। কংগ্রেস থেকে বিজেপি পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস যে দলই ক্ষমতায় বসেছে, ভারতকে ৭৫ বছর ধরে তারা এই পুঁজি নির্ধারিত পথেই নিয়ে গেছে। ওদের কাছে স্বাধীনতা মানে, শোষণের স্বাধীনতা।

এর বিরুদ্ধে যাতে প্রতিবাদ না ওঠে, তার জন্য স্বাধীন ভারতের শাসক শ্রেণি দেশের মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত চালিয়ে গেছে শুরু থেকেই। সরকারগুলি এনেছে একের পর এক কালা আইন, যার সাহায্যে বাকস্বাধীনতা, সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদের অধিকারটাও হরণ করা হয়েছে। আর এখন দেশের মানুষের ফোন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে আড়িপেতে সরকার আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে এ দেশে স্বাধীনতা আছে শুধু পুঁজির শোষণের। দেশের খেটেখাওয়া মানুষের জন্য স্বাধীনতার সব অর্থ ওরা মুছে দিতে চায়।

৭৫ বছরের স্বাধীন ভারতে সব নাগরিক দাঁড়িয়ে এক অনিশ্চয়তার সামনে। এত বছর পরে তাদের সকলকে দিতে হবে নিজের নাগরিকত্বের প্রমাণ! শুধু নিজের জন্মের প্রমাণ দিলে হবে না, বাপমায়ের জন্ম ঠিকুজি থেকে শুরু করে পূর্ব পুরুষের সব ইতিহাস খুঁজে বার করতে না পারলে ঠাঁই হবে ডিটেনশন ক্যাম্প নামক নির্যাতন শিবিরে। এনআরসি-র নামে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত নাগরিকের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে।

৭৫ বছরের স্বাধীনতায় ভারতের জনগণের জন্য নেই সকলের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার। ফেলো কড়ি মাখো তেল এই নীতিতেই আজ চলছে ভারতের শিক্ষা। কংগ্রেস থেকে বিজেপি যে সরকারই 'জাতীয় শিক্ষানীতি' এনেছে তারাই চেষ্টা করেছে সাধারণের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেড়ে নিতে। শিক্ষা ব্যবস্থা আজ কর্পোরেট পুঁজির মুনাফার ক্ষেত্র। ভারতীয়ত্বের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুক চিন্তায় আচ্ছন্ন করতে চাইছে শিক্ষার পরিমণ্ডল। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ সৃষ্টি করেছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। সাম্প্রতিক মহামারি দেখিয়ে দিয়েছে এর ফল কী মারাত্মক হতে পারে। দেশের মানুষের জীবনের প্রতি শাসক শ্রেণির এতটুকু দায়বদ্ধতা থাকলে অন্তত মানুষের জীবন নিয়ে এই ব্যবসা তারা চলতে দিতে পারত কি!

আজকের ভারতে শাসনক্ষমতায় আসীন আরএসএস-বিজেপি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সব আলো নিজেদের মুখে ফেলতে ব্যগ্র। অথচ এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তাঁদের ভূমিকা কী? যে সময় সারা দেশ লড়ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তখন বিজেপির পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস ছিল কার্যত ব্রিটিশের পক্ষে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে বলতে হয়েছিল, 'আজকে হিন্দু মহাসভা মোসলেম বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অবলীলাক্রমে ইংরাজের সঙ্গে মিলতে পারে...। এর জন্য ইংরাজের শরণাপন্ন হতে হলেও তাদের কোনও আপত্তি নেই। ... মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রু হল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ এবং যে সমস্ত ভারতবাসী এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাদের সাহায্য করে তারাও।' (১৯৪০ সালের ১৫ মে, ২৪ পরগণার যুব সম্মেলনে ভাষণ) মনে রাখতে হবে আরএসএসের গুরু গোলওয়ালকর সহ সকলেই বারবার ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন। ওদের পূজ্য সাভারকর ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে বলেছিলেন, চিরকাল অনুগত হয়ে থাকবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি কখনও ভাঙেননি। হিন্দু মহাসভা-মুসলিম লিগের মতো শক্তিকে এ জন্যই নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশের শত্রু বলছেন। আজ তাদের ঐতিহ্যবাহী বিজেপি পালন করবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর? অগণিত শহিদের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার এ অপমান দেশবাসী মানতে পারে?

একই সাথে বলা দরকার শুধু বিজেপি নয়, যে দলগুলি এ দেশের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে কাজ করে চলেছে তাদের কারও আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবের কথা বলার কোনও অধিকার নেই। কংগ্রেসের যে নেতারা স্বাধীন ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণির বকলমে ক্ষমতা দখল করেছিল তাদের উত্তরাধিকারীরাই কায়েম করেছে গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরাচার। এনেছে ফ্যাসিবাদের রূপরেখা। কংগ্রেস ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মদত দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে, যার সুযোগ নিয়েছে আজকের বিজেপি। এমনকি বৃহৎ বামপন্থী বলে পরিচিত যে দলগুলি স্বাধীন ভারতে নানা সময় রাজ্যে রাজ্যে শাসকের ভূমিকা পালন করেছে, তাদের ইতিহাসও বলে, দেশের মানুষের গণমুক্তির অকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ভূমিকা প্রয়োজন ছিল তারা এর ধারে কাছে যায়নি। এর ফল ভুগছে দেশের সাধারণ মানুষ।

যে সত্যটা বুঝতে হবে— বুর্জোয়া শাসন আজ আর কোনওভাবেই প্রকৃত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা দিতে পারে না। মহান নেতা লেনিন দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়ারা এ যুগে গণতান্ত্রিক বিপ্লবটাও পুরোপুরি সফল করতে অক্ষম। আজকের দিনে তারা আরও প্রতিক্রিয়াশীল। ফলে সে দিন গণতন্ত্রের যে ছিটে-ফোঁটা তারা মানত, আজ তাও করে না। আজ দুনিয়া জুড়েই বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে জবরদস্তির উপর। তাদের লক্ষ্য চরম শোষণ, আর তার জন্যই শাসন। এই জবরদস্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা বুর্জোয়া সমাজকে ভাঙতে না পারলে আজ আর সাধারণ মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে না। এই সমাজকে ভেঙে শোষণহীন সমাজ কায়েম করতে না পারলে স্বাধীনতা অধরাই থেকে যাবে। আজকের দিনে তাই স্বাধীনতা দিবসে শত শত শহিদের আত্মদানের প্রেরণায় নিতে হবে গণমুক্তির শপথ। যে শপথ নিতে গেলে আজ চিনে নিতে হবে যথার্থ বিপ্লবী শক্তিকে, দাঁড়াতে হবে তার পাশে।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার নড়িহা-সুরুলিয়া পঞ্চায়েতের কালুহার গ্রামের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সংগঠক কমরেড নলিনীরঞ্জন মাহাত বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৪ মে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

গত শতকের ছয়ের দশকের শেষের দিকে তিনি কমরেড সাধু ব্যানার্জী ও কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর মাধ্যমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ধীরে ধীরে সংগঠনের দায়িত্ব নিতে শুরু করেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে কৃষক খেতমজুর সংগঠন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তিনি দলের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হন। পরিবারে প্রবল অর্থ সংকট থাকলেও তিনি দলের ছোটদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

কংগ্রেস সরকারের আমলে খাদ্যসঙ্কটের সময় তিনি ব্লক স্তরে দলের পক্ষ থেকে ত্রাণ কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ত্রাণ বন্টনে গাফিলতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে শাসক দল তাঁর বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা করে। যদিও দীর্ঘদিন মামলা চলার পর তিনি মামলা থেকে নিঃশর্তে মুক্তি পান। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন। তিনি ১৯৭৪ সালে পুরুলিয়া জেলার আইন অমান্য কর্মসূচিতে প্রায় ১৫ দিন কারাবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পেশাগত অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানান। দলের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড হরলাল মাহাত এবং কমরেড প্রবীর মাহাত। এছাড়াও বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড নলিনীরঞ্জন মাহাত লাল সেলাম

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ ৮০তম বর্ষে ফিরে দেখা

১৯৪২ বললেই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই স্লোগান— 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'। ভেসে ওঠে সংগ্রামের পতাকা হাতে স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার মানুষের প্রাণবলিদানের ছবি। সংগ্রামের পতাকা হাতে নিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু আজও দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা দেয়। একজন সাধারণ গ্রাম্য মহিলা থেকে এক স্মরণীয় বিপ্লবী চরিত্র হিসাবে তিনি গড়ে উঠেছিলেন যে সংগ্রামের আগুনের স্পর্শে তা ছিল ঐতিহাসিক ব্রিটিশ বিরোধী ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন। পরাধীন ভারতের সর্ববৃহৎ এবং সর্বব্যাপক গণআন্দোলন হিসাবে ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছে এই আন্দোলন। ঘটনাবহুল স্বাধীনতা আন্দোলনে এত বড় জনজাগরণের নজির আর নেই। কোনও উপযুক্ত নেতৃত্ব ছাড়াই দলে দলে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মহিলা সহ সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ব্রিটিশ শাসকের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছে পুলিশের গুলিতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, জেলে গিয়েছে, তবু পিছু হটেনি।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার কথা বলেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র। ডাক দিয়েছিলেন ব্যাপক গণআইন অমান্যের। কিন্তু কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সর্বাত্মক সংগ্রামের পথে যেতে রাজি হয়নি। উপরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাবের জন্য নেতাজিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। নেতাজির বহিষ্কার, রামগড়ে তাঁর নেতৃত্বে বাম সংহতি সম্মেলন, আন্তর্জাতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে তাঁর মহানিষ্ক্রমণের ঘটনা সারা দেশের মুক্তিকামী মানুষ, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনার জন্ম দেয়, যা কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্বের উপর প্রবল চাপ তৈরি করে। বাধ্য হয়ে গান্ধীজি '৪২-এর ৯ আগস্ট থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা দরকার তার কিছুই তাঁরা করলেন না। উপরন্তু ৯ আগস্ট ভোরেই কংগ্রেসের নেতারা গ্রেফতার হয়ে সবাই জেলে চলে গেলেন। জনতা হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ নেতৃত্বহীন। কিন্তু মানুষের মধ্যে পরাধীনতার জ্বালা কী তীব্র ছিল, স্বাধীনতার আকাঙ্খা কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছিল পরবর্তী ঘটনাগুলিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। জনতার রুদ্ধ রোষ দেশব্যাপী ফেটে পড়ল।

সারা দেশে হরতাল, কলকারখানায়-স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, বিক্ষোভ, সমাবেশের জোয়ার বয়ে গেল। শুরু থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসন নির্মম ভাবে এই বিক্ষোভ দমন করতে থাকল। দমন নীতির তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলল। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন উপড়ে, ব্রিজ ভেঙে, সরকারি অফিস-কাছারি বন্ধ করে, আগুন লাগিয়ে তারা প্রাণপণ লড়াই করল। আন্দোলন এগিয়ে চলল আপন গতিতে।

বিদ্রোহী জনতা দেশের নানা জায়গায় ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন স্থায়ী ও সফল হয়েছিল মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। এ ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের নানা জায়গায় ব্রিটিশ শাসন সাময়িক ভাবে উৎখাত হয়েছিল। এই গণবিদ্রোহে ছাত্র-যুব, শ্রমিক কৃষকরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা এই বিদ্রোহ থেকে দূরেই ছিল।

৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় অফিসে বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ

আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ প্রশাসন নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। পুলিশের হাতেই দেশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বহু ছোট-বড় শহরকে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দশ হাজারের বেশি মানুষ পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচারে নিহত হয়েছিল। অসংখ্য মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিলেন। লক্ষাধিক মানুষকে গ্রেফতার করে জেলে ভরা হয়েছিল। যেসব জায়গায় আন্দোলন বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সেখানে গ্রামগুলিতে পিটুনি কর চালু করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের ধরে ধরে চাবুক মারা হয়েছিল। ১৮৫৭-র পরে সরকারি দমননীতির এমন তাণ্ডবলীলা আর কখনও দেখা যায়নি। দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য কী পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত এই আন্দোলন তা স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

এই আগস্ট আন্দোলনেই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান অনুশীলন সমিতির তৎকালীন অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক শিবদাস ঘোষ। জেলে বসেই তিনি মার্ক্সবাদের গভীর চর্চা করেন এবং উপলব্ধি করেন, এতবড় গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামের সুফল আত্মসাৎ করতে চলেছে পুঁজিপতি শ্রেণি। তাই তিনি একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন। এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই তিনি এ যুগের একজন মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে গড়ে ওঠেন এবং যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)কে গড়ে তোলেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মতো এত বড় গণজাগৃতি হলেও তাতে সামিল হয়নি কেন্দ্রের বর্তমান শাসক দল বিজেপির পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস। তারা এর সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছিল, এমনকি আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যও করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তখন বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য। ব্রিটিশের অনুগ্রহ লাভের আশায় ১৯৪২-এর ২৬ জুলাই তিনি বাংলার গভর্নর জন হার্বার্টকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনাদের এক জন মন্ত্রী হিসেবে, আমি পূর্ণ সহযোগিতা জানাচ্ছি। ... যুদ্ধ চলার সময়ে যদি কেউ জনতার আবেগ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়, সরকার যেন তার প্রতিরোধ করে।' ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বললেন, 'আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সহায়তা হবে।' ভারত ছাড়ো আন্দোলন শ্যামাপ্রসাদের কাছে 'অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা' ও 'নাশকতামূলক' কাজকর্ম। আরএসএসের গুরু গোলওয়ালকরের কাছে ব্রিটিশের অত্যাচারকে মনে হয়েছিল স্বাভাবিক। তার বক্তব্য ছিল, 'বড় মাছ তো ছোট মাছকে গিলে খাবেই।' এই সব 'দেশপ্রেমিক'রা ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমন করার নানা পন্থার একটা তালিকাও ব্রিটিশ সরকারকে দিয়েছিলেন। ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হওয়ার দেড় বছর পর, ব্রিটিশ রাজের অধীনস্থ বম্বে সরকার একটি নোটে উল্লেখ করে, 'সঙ্ঘ (আরএসএস) যথাযথভাবে নিজেদের আইনের সীমানায় সংযত রেখেছে, এবং ১৯৪২ সাল থেকে শুরু হওয়া দেশজোড়া অশান্তির সাথে কোনও ভাবেই নিজেদের জড়ায়নি।' বস্তুত, স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও কিছুতেই তারা জড়ায়নি। এতে আরএসএসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল। কারণ তারা চোখের সামনে দেখছিল দেশের জন্য মানুষের আত্মদান আর নেতারা তাদের বোঝাচ্ছিল ধর্মীয় বিভাজনের পাঠ। কর্মীদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে সঙ্ঘ নেতারা আশ্রয় নিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের। তারা ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিত করে দলের কর্মীদের উত্তেজিত করত। আজকের স্বঘোষিত দেশপ্রেমিকদের এই হল প্রকৃত ইতিহাস। তাদেরই উত্তরসূরিরা আজ ক্ষমতায় বসে দেশের মানুষকে দেশপ্রেমের শিক্ষা দিচ্ছে! শুধু আরএসএস-ই নয়, মুসলিম মৌলবাদী শক্তি মুসলিম লিগও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল।

এই আন্দোলনে অবিভক্ত সিপিআই-এর ভূমিকা কী ছিল? অবিভক্ত সিপিআই (যার মধ্যে সিপিএম এবং সিপিআইএমএল নেতারা ছিলেন) সেদিন যে ভূমিকা নিয়েছিল তা বামপন্থীদের প্রকৃত কর্তব্যের ঠিক বিপরীত। স্বাধীনতার লক্ষ্যে এত বড় একটা গণআন্দোলন হল অথচ সিপিআই নেতারা গোটা সময়টা হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন। তাঁরা বললেন, যেহেতু যুদ্ধে ব্রিটেন সোভিয়েতের সহযোগী তাই ভারতে ব্রিটিশের বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। শুধু তাই নয়, তাঁরা ভারত ছাড়ো আন্দোলনেরই বিরুদ্ধতা করতে থাকলেন। সাধারণ শ্রমিকরা যখন কলকারখানায় আন্দোলন করছে, ধর্মঘট করছে তখন কমিউনিস্ট নামধারী এইসব নেতারা তার বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। তাঁরা বলেছেন, এখন উৎপাদন ব্যাহত হলে ব্রিটিশ যুদ্ধে হেরে যাবে। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন নেতাজি যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক সংগ্রামে লিপ্ত তখন এই নেতারা নেতাজিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কুকুর বলে গালি দিতে থাকলেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই অ-কমিউনিস্টসুলভ ভূমিকার জন্য সিপিআই নেতাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন মহান স্ট্যালিন।

অবিভক্ত সিপিআই যদি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠত স্বাধীনতা আন্দোলন নিঃসন্দেহে অন্য মাত্রা পেত। স্বাধীনতার সুফল দেশের পুঁজিপতিরা এ ভাবে আত্মসাৎ করতে পারত না। মালিকশ্রেণির স্বার্থে দেশের সাধারণ মানুষের উপর কংগ্রেস-বিজেপির চালানো দাঙ্গা-শোষণ-নিপীড়ন হয়ত আজ দেখতে হত না। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও মানুষের এমন দুঃসহ অবস্থা— খাদ্য নেই, শিক্ষা নেই, রোগে ওষুধ নেই, মহামারীতে পোকা-মাকড়ের মতো মানুষ মারা যাচ্ছে, বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে, ভোটবাজ দলগুলির নেতারা প্রতিনিয়ত পুঁজিপতিদের তোষামোদ আর সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে চলেছে— হয়ত এর কোনও কিছুই দেখতে হত না। মানুষের সত্যিকারের মুক্তির জন্য সংগ্রামে সঠিক নেতৃত্ব, সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি কেন প্রয়োজন ভারত ছাড় আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণের এটা একটা বড় শিক্ষা। এই উপলব্ধি থেকেই এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ কঠিন কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্যিকারের কমিউনিস্ট দল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই দলকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার উপলব্ধি।

পরিবহণের অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলুন

এআইডিএসও-র আন্দোলন শিক্ষক সমাজকেও ভাবাচ্ছে

সমস্ত ফি মকুব, অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা প্রভৃতি দাবিতে পুলিশি নির্যাতনের মোকাবিলা করে রাজ্যব্যাপী পথ অবরোধ এই করোনা বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলনে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। এই দাবিগুলি সহ ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্য কমিটির আহ্বানে সারা রাজ্যেই বাঁকুড়া শহরে শুরু হয়েছে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। কয়েকদিন আগে ১১ জন ছাত্রকর্মীর মুক্তির দাবিতে গড়ে ওঠা উত্তাল আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এই শহরে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক অভূতপূর্ব আবেগ। নিজস্ব উদ্যোগে প্রচার টেবিলে রাখা স্বাক্ষর ফর্মে স্বাক্ষর করে যাচ্ছেন তাঁরা। জানিয়ে যাচ্ছেন দাবিগুলির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, বাড়িয়ে দিচ্ছেন আর্থিক সাহায্য। এক ছাত্রকর্মীর হাত থেকে কলম নিয়ে এক ব্যক্তি স্বাক্ষর করে বললেন, 'শিক্ষাকে বাঁচানোর দাবিতে আজ যদি না তোমাদের আন্দোলনের পাশে থাকি, তাহলে জীবনে করব কি?' পথচলতি এক প্রবীণ মহিলা হঠাৎই পোস্টার-ব্যানার দেখে দাঁড়িয়ে যান। কাছে এসে স্বাক্ষর করেন এবং এক গভীর মাতৃস্নেহে জিজ্ঞাসা করে বলেন, 'তোমাদের এই আন্দোলনের সেই ১১ জন কি ছাড়া পেয়েছে? তোমাদের জন্য এই কদিন বড়ই কষ্ট পেয়েছি।' এভাবেই স্বাক্ষর করতে এসে বহু মানুষ পরম স্নেহে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের ১১ জনকে ছেড়েছে তো?' এক শিক্ষক এসে বললেন, 'স্বাক্ষর তো করবই, কিন্তু তোমাদের সেই ১১ জন আন্দোলনকারীকে কি জেল থেকে ছেড়েছে?...চিন্তা করো না ভাই, তোমাদের এই আন্দোলন আজ সমগ্র শিক্ষক সমাজকেও ভাবিয়েছে। যে কোনও ধরনের সাহায্যে আমাকে তোমাদের পাশে সবসময় পাবে, আন্দোলন তোমরা চালিয়ে যাও।' কেউ বলেছেন, 'স্কুল কলেজ এখনই খুলে দেওয়া দরকার। আমাদের ছেলেমেয়ের তো সর্বনাশ হয়ে গেল!' একজন বরিষ্ঠ নাগরিক স্বাক্ষর করে বললেন, 'তোমাদের দাবি অত্যন্ত সঠিক। অথচ পুলিশ তোমাদেরকেই অত্যাচার করল! আমি সবসময়তোমাদের পাশে আছি।' একজন অশীতিপর বৃদ্ধ আশা ব্যক্ত করে গেলেন, সামনের দিন খুব ভয়ঙ্কর। তোমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তা ছাড়া আর কে আছে বলো তো?'

ধার মেটাতে কিডনি বিক্রি আসামে

বিজেপি শাসিত আসামে মাইক্রোফিনান্স বা ক্ষুদ্র পুঁজির ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন বহু মানুষ। ঘটিবাটি বেচেও সেই ঋণের সুদ মেটানো যাচ্ছে না। পাওনাদারদের তাড়ায় অধিকাংশ গ্রামবাসী শেষপর্যন্ত বাধ্য হচ্ছেন কিডনি বেচতে।

করোনা অতিমারিতে অভাবের জেরে গত এক বছরে এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। গরিব মানুষের টাকার প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে জাল বিস্তার করেছে অঙ্গ পাচারকারীরা।

তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে মরিগাঁও জেলার দক্ষিণ ধরমতুল গ্রামই কিডনি পাচারের কেন্দ্রবিন্দু। দালাল চক্রের হোতারা কিডনি দাতাদের আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাজ্য অঙ্গদান সংস্কৃতি কমিটির কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের দিয়ে বলানো হয়, তারা স্বেচ্ছায় কিডনি দান করতে যাচ্ছে। এরপর ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কলকাতায় এনে কিডনি বের করে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো টাকা পান না কেউই। অনুমান, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ জনের কিডনি বিক্রি করেছে এই চক্র।

পেশায় রাজমিস্ত্রি সুমন দাস থাকেন মরিগাঁও জেলার এক গ্রামে। তাঁর ছেলের হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে। অস্ত্রোপচার দরকার। কিন্তু টাকা নেই। তাই নিজের একটি কিডনি বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন। ৫ লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও পেয়েছেন মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। তা দিয়ে ছেলের ঠিক মতো চিকিৎসা করাতে পারেননি। এদিকে একটি কিডনি চলে যাওয়ায় তাঁর কাজ করার ক্ষমতা কমে গিয়েছে। সুমনের স্ত্রী এক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'রোজই টাকার জন্য তাগাদা দেয় সংস্থার কর্মীরা। তাই ভেবেছিলাম, যদি মোটা টাকা পাওয়া যেত, সমস্যা মিটত।' মাইক্রোফিনান্স সংস্থা থেকে মহিলাদের নেওয়া ঋণ মকুব করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। কিন্তু এখন বিভিন্ন শর্ত চাপিয়ে নেতা-মন্ত্রীরা কথা ঘোরাতে ব্যস্ত। বিজেপির প্রতারণায় মানুষ ক্ষুব্ধ। তাদের সুশাসনের কঙ্কালসার চেহারা উঠে এসেছে কিডনি পাচারের ঘটনায়।

পূর্ব মেদিনীপুরে মদবিরোধী আন্দোলন

কোলাঘাট ঃ কোলাঘাট স্টেশন চত্বরে চোলাই মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে ৩১ জুলাই কোলাঘাট স্টেশন ও সড়ক সেতু এরিয়া বাজার কমিটির উদ্যোগে এলাকার শতাধিক মানুষ প্রতিবাদ মিছিল করেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মদ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে ওই দিন আবগারি দপ্তরের কোলাঘাট সার্কেলের ওসি-কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

তমলুক ঃ তমলুকের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ২ জন মদ ব্যবসায়ী তাদের বাড়ি থেকে মদবিক্রির যে কারবার চালাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির তমলুক শাখা ৩০ জুলাই কাউন্সিলারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। তিনি তিন দিনের মধ্যে মদ ব্যবসা বন্ধকরার নির্দেশ দেন। এতে পাড়ার মানুষজন এবং পরিচারিকারা আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানান।

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ

২৫ জুলাই দক্ষিণ গোয়ায় চার দুষ্কৃতী পুলিশ সেজে ২ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার নিন্দা না করে রাজ্যের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেন, এর জন্য দায়ী বাবা-মায়েরাই। সন্তানদের সুরক্ষা দেওয়ায় তাদের ব্যর্থতার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এই ঘটনা এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির তীব্র নিন্দা করেছে। সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছবি মহান্তি ৩০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতিতে দুষ্কৃতীরাই ইন্ধন পাবে। নারীর নিরাপত্তা প্রদানে বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা এবং পুলিশি অপদার্থতাকেই আড়াল করার চেষ্টা করেছেন তিনি। কমরেড মহান্তি বলেন, পুরুষতান্ত্রিক এবং নারীবিদ্বেষী এই বিবৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

ত্রিপুরায় এ আই এম এস এস-এর বিক্ষোভ

দিল্লিতে কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ত্রিপুরার আগরতলায় ৬ আগস্ট এআইএমএসএস-এর বিক্ষোভ

বন্যাদুর্গতদের ক্ষতিপূরণের দাবি

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত ব্লক ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিকাশি খাল-নালাগুলি সংস্কার না হওয়ায় বৃষ্টির জল জমে গিয়ে ধান, পান, মাছ, ফুল, সবজি প্রভৃতি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তারও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। অবিলম্বে জলনিকাশির ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসকের কাছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় সোয়াদিঘী-গঙ্গাখালি-পায়রাটুঙ্গী-দেহাটী সহ জেলার ১৭টি ছোট-বড় নিকাশি খাল সংস্কার, জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজ, নূতন জেলাশাসক অফিস লাগোয়া এলাকার জলনিকাশির বন্দোবস্ত প্রভৃতি।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি শিলাবতী নদীবাঁধ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, জলবন্দি এলাকায় পানীয় জল, শুকনো খাবার, ত্রিপল সহ দ্রুত ত্রাণ বণ্টন, উদ্ধারকার্যের জন্য পর্যাপ্ত নৌকা ও স্পিড বোট নামানোর দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসককে বার্তা পাঠিয়ে দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জানায়। সেচ দপ্তরেও দাবি জানানো হয়। ৩১ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ঘাটাল লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এসডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের কাজ ও সুরক্ষার দাবি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৮ জন পরিযায়ী শ্রমিকের পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, এই মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বেকার যুবকদের দুরবস্থা। পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু নিত্যদিনের ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। সরকার সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য নির্ধারণ করছে। সরকারের উচিত হাজার হাজার সরকারি শূন্যপদ পূরণ করা, বন্ধকলকারখানা খোলা, নতুন পদ সৃষ্টি করা, রাজ্যেই কর্মসংস্থান ও সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারকে নেওয়া।

৮ আগস্ট 'মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল' শোক বেদিতে মাল্যদান করে সারা বাংলা শোক দিবস পালন করে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা মৃতদের পরিবারের একজনের চাকরি ও ১০ লক্ষ টাকা, আহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবি জানান।

রান্নার গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং পরিচারিকাদের নানা দাবিতে ৭ আগস্ট সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উদ্যোগে ঢাকুরিয়া স্টেশনে প্রচার চলছে।

বিমা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে
এ আই ইউ টি ইউ সি-র বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সংসদের বাদল অধিবেশনে কোনও আলোচনা ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নিচ্ছে একের পর এক জনবিরোধী বিল। ঠিক এ ভাবেই তারা ২ আগস্ট পাশ করিয়ে নিয়েছে 'জেনারেল ইনসিওরেন্স বিজনেস (ন্যাশনালাইজেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল'।

এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থাগুলিতে সরকারের ৫১ শতাংশ শেয়ার রাখার বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। এর ফলে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি বিমা কোম্পানিগুলির বেসরকারিকরণের পথ পুরোপুরি খুলে গেল। এর ফলে সাধারণ বিমাকারীদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বিমা সংস্থাগুলিকে দেশি বিদেশি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত জনবিরোধী। তিনি দেশ জুড়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষ, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

নার্স-আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

একের পাতার পর

কেউ নাইট, কেউ মর্নিং ডিউটি করে এই আন্দোলনে এসেছেন, কেউ আবার ফিরে গিয়ে ইভনিং বা নাইট ডিউটিতে যোগ দিয়েছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে রাজ্যের বেশিরভাগ নার্সিং কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন সর্বশক্তি দিয়ে। পাশে দাঁড়িয়েছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, এ আই এম এস এস, এ আই ইউ টি ইউ সি, পিএমপিএআই সহ নানা সংগঠন।

সরকারি সকল স্তরের নার্সিং অফিসাররা কংগ্রেস সরকারের সময় থেকেই তাঁদের ন্যায্য বেতন কাঠামোতে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। নার্সিং অফিসারদের দাবি সত্ত্বেও বেতন কমিশন বা রাজ্য সরকার চরম বেতন বঞ্চনা নিরসন করে যুক্তিভিত্তিক, ন্যায়সঙ্গত বেতন কাঠামো নির্ধারণ করেননি। (জিএনএম) ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত নার্সিং অফিসারদের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হিসাবে বেতন কাঠামো এ পর্যন্ত নির্ধারণ করাই হয়নি। বেতন কমিশন যেমন বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিভিত্তিক, মর্যাদাকর বেতন কাঠামোর সুপারিশ করেনি, তেমনই একের পর এক নির্বাচিত রাজ্য সরকারও তাঁদের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হিসাবে গণ্যই করেননি।

এ ছাড়া কমিউনিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত এএনএম (আর) থেকে পিএইচএন, ডিপিএইচএন, অন্যদিকে নার্সিং-স্কুল, কলেজের টিচার, ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর, লেকচারার, প্রফেসর, হাসপাতালের সিস্টার ইনচার্জ, ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পর্যন্ত কে হননি এই চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ কাল, অভিজ্ঞতা, কাজের দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করার নীতি নার্সিং কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়নি। বেতন কমিশন ও রাজ্য সরকার এইভাবে বঞ্চনা করে নার্সিং কর্মচারীদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদাকে যেমন ক্ষুন্ন করেছে, তেমনই সমগ্র নার্সিং পেশার গুরুত্বকে লঘু করছে।

কোভিড পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রেখে এঁরা যোদ্ধার ভূমিকা পালন করলেও এদের প্রতি সরকারি বঞ্চনা এতটুকু কমেনি। ফলে ক্ষোভের বারুদ জমছিলই।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে টানা আন্দোলন চলছিল নার্সিং কর্মচারীদের। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যকর্তা, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর নানা টালবাহানা করতে থাকে। অবশেষে এ বছরের জুলাই মাস ধরে তীব্র আন্দোলন করতে বাধ্য হন নার্সিং কর্মচারীরা। বেতন বঞ্চনা নিরসন, সকল প্রশিক্ষিত নার্সকে স্থায়ী পদে নিয়োগ, নার্সিং কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক অত্যাচার বন্ধের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও কাজ না হওয়ায় ২৬ জুলাই থেকে নার্সিং কর্মচারীরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন এসএসকেএমে। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ১০ হাজারেরও বেশি নার্স এতে যোগ দেন। টানা ১২ দিন অবস্থানের পর সরকারের টনক নড়ে। ৬ আগস্ট নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা ভাস্বতী মুখার্জী ও সভানেত্রী পার্বতী পালকে ডেকে পাঠান স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রী ৩-৪ মাসের মধ্যে দাবি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। এই ঐতিহাসিক জয় প্রমাণ করল ভোটে নয়, এমএলএ-এপি-মন্ত্রীর জোরে নয়, সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একমাত্র দাবি আদায় সম্ভব।

স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও কোভিড ভ্যাক্সিনটুকু পাচ্ছে না মানুষ

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করতে চলেছে দেশ। কিন্তু অতিমারি পরিস্থিতিতে দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের ৭৩ শতাংশেরও বেশি এখনও একটি টিকাও পাননি। সরকারের কো-উইন পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ দু'টি ভ্যাক্সিন পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, করোনা মোকাবিলায় নাগরিকদের টিকা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, প্রতিটি রাজ্যে পর্যাপ্ত টিকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তব কী বলছে?

করোনা অতিমারি দেড় বছরে পড়লেও এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেঘোরে প্রাণ হারালেও নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য টিকাকরণ করে উঠতে পারছে না বিজেপি সরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকাকরণের গতি বাড়াতে না পারলে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এখনকার মতো ঢিমেতালে টিকাকরণ চললে আগামী দু'বছরেও সকলে টিকা পাবে না। মানুষ হন্যে হয়ে ছুটছে করোনার প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন নিতে। কিন্তু পাচ্ছে না। স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দিতে দেশের সরকার যে পুরোপুরি ব্যর্থ তা আবারও প্রমাণ হল।

বাজেটে ভ্যাক্সিনের জন্য মাত্র ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে মাত্র ৯,৭২৫ কোটি টাকা। করোনা সংক্রমণে, বিনা অক্সিজেনে, বিনা ওষুধে, করোনা-পরবর্তী রোগে ভুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল, অথচ বরাদ্দ অর্থ সরকার ভ্যাক্সিন এবং চিকিৎসা কোনও কাজেই লাগাতে পারল না। দেশীয় ভ্যাক্সিনের উৎপাদন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাড়িয়ে, বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিন আনিয়ে এবং বৈষম্য না করে রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভ্যাক্সিন সরবরাহ করে নাগরিকদের এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচাতে যে তৎপরতা দরকার ছিল তার ছিটেফোঁটাও সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। অথচ 'সাফল্য' প্রচারে কোটি কোটি টাকা খরচ করে চলেছে সরকার।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক সুপ্রিম কোর্টকে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, ডিসেম্বরের মধ্যে ১৮ বছরের বেশি বয়সী সকলের দুই ডোজ টিকা দেওয়া হবে। কিন্তু ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে যা জোগান দেওয়ার কথা ছিল, তার থেকে দু'কোটিরও বেশি ডোজ টিকার জোগানই দেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

ভ্যাক্সিনের অভাবে সর্বত্র মানুষ রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়েও পাচ্ছেন না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বলছে কোনও রাজ্যেই প্রতিষেধকের ঘাটতি নেই। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি সহ বেশ কিছু রাজ্যে ভ্যাক্সিনের অভাবে মাঝেমাঝেই টিকাকরণ বন্ধ রাখতে হয়েছে। বহু বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভ্যাক্সিন নিতে বাধ্য হচ্ছেন বহু মানুষ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে টিকা অতিরিক্ত পরিমাণে থাকলেও সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেখানে বিনামূল্যে টিকা নিতে হাজার হাজার মানুষ লম্বা লাইন দিচ্ছেন, সেখানে তার অভাব। 'বন্ধু' কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের টিকা নিয়ে মুনাফা করার সুযোগ করে দিতেই এমন ব্যবস্থা। চাহিদা ও জোগানের ফারাক তৈরি করে উৎপাদক কর্পোরেট কোম্পানিগুলি মোটা অঙ্কের মুনাফা ঘরে তুলছে।

সরকার ঠিকমতো পরিকল্পনা করলে সকলকে টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত অনায়াসেই করতে পারত। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থেই তা করল না। এর ফল দেশের মানুষকে ভুগতে হচ্ছে জীবন দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের প্রচারে এসেও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিজেপি জয়ী হলে বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা করবেন। শুধু জয়ী হলে কেন? দেশের সব মানুষকে টিকা দেওয়া কি সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না? আসলে তা ছিল নির্বাচনী জুমলা। ঠিক যেমন বিজেপি ২ কোটি বেকারকে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সকল নাগরিকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কৃষকদের ফসলের উপযুক্ত দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল— নানা সময়ে নির্বাচনে সুবিধা আদায় করতে তারা দেশের মানুষকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরে এ সমস্তই তারা জুমলা বা কথার কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ ভ্যাক্সিন দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিজেপি নেতাদের নানা প্রতিশ্রুতিও দেশবাসীর কাছে কথার কথাই রয়ে গেছে।

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে বুক স্টল। সিংঘু বর্ডার, দিল্লি। ৭ আগস্ট।

সিঙ্গুর নিয়ে চোখের জল

একের পাতার পর

এস্টেট কারবারই যে আসল উদ্দেশ্য তা বহু বার দলীয় মুখপত্র গণদাবীতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি এও দেখানো হয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভয়াবহ মন্দাজনিত পরিস্থিতিতে কেন শিল্পায়ন হতে পারে না। অর্থনীতিতে মন্দা মানে বাজার সঙ্কট, মানে লোকের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে। এই অবস্থায় শিল্প পণ্য কিনবে কে? দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ গরিব নিম্নবিত্ত। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি জীবনধারণের প্রাথমিক উপাদানগুলোজোগাড় করতেই তারা হিমসিম খাচ্ছে। এদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কি কখনও শিল্পায়ন হতে পারে? হতে যে পারে না, আজ রাজ্যে রাজ্যে অসংখ্য বন্ধ কারখানা এবং শিল্প উৎপাদনের শোচনীয় হাল তারই সাক্ষ্য দেয়। পুঁজিবাদী আর্থিক নীতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই উৎপাদনের লক্ষ্য। ফলে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে সর্বোচ্চ শোষণ চলে। আর এটাই ডেকে আনে পুঁজিবাদের সঙ্কট, শিল্পের সঙ্কট। এই অবস্থায় শুধু শিল্পায়ন করব, এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা শিল্প হতে পারে না। তাই আজ ভারতের কোনও রাজ্যেই শিল্পায়ন হচ্ছে না। একটা দুটো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পুঁজিনির্ভর শিল্প এখানে সেখানে হতে পারে। এর বেশি নয়। শ্রমিক প্রধান শিল্প বন্ধ করে, যন্ত্র প্রধান শিল্প— সর্বোচ্চ মুনাফার অন্যতম শর্ত। তাই কারখানা হলেও কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এই অবস্থায় শিল্পায়নের স্লোগান নিছক ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পায়নের রুদ্ধ দরজা খুলে দিতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পাল্টে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করা জরুরি। এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া এ কথাটা কোনও দলই বলেনি, বলছেও না। ফলে আন্দোলনকারী সকলকে এক বন্ধনীতে ফেলে যে অভিযোগ সম্পাদকীয়তে করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন হল, সিঙ্গুর আন্দোলনের ১২ বছর পর হঠাৎ শিল্পমন্ত্রী এই বিবৃতি দিলেন কেন? টাটাদের সাথে তাদের অর্থাৎ তৃণমূলের কোনও বিরোধ নেই একথা ঘটা করে বলার হেতু কী? হেতু স্পষ্ট, তা হল একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠী টাটাদের এই বার্তা দেওয়া যে, আমরা তোমাদেরই লোক। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'টাটার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে দেব না', বর্তমান শিল্পমন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। অর্থাৎ চাই পুঁজিপতিদের ব্যাকিং।

সিপিএম নেতা জ্যোতি বসুর মতোই প্রায় প্রতি বছর শিল্প সম্মেলন করে শিল্পপতি ধরে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর থেকে লন্ডন ছুটলেও এবং বহু লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এলেও বাস্তবে সিপিএম আমল থেকেই উল্লেখ করার মতো কোনও শিল্প পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। এদিকে বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এক সময় তেলেভাজা শিল্প, মুড়িভাজা শিল্প---- এসব বলে তৃণমূল সরকার জনমানসে প্রবল সমালোচিত হয়েছে। সিপিএম, বিজেপি পুঁজিবাদের প্রকৃত সংকটকে আড়াল করে সিঙ্গুর নিয়ে চোখের জল ফেলে। একদল শিক্ষিত মানুষও এই সিঙ্গুর প্রশ্নে সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন। যুক্তি দিয়ে তারা বিচার করে দেখেন না, গুজরাটের সানন্দে আঁতুড়ঘরেই ন্যানোর ইন্তেকাল ঘটল কেন? সেখানে তো আন্দোলন হয়নি। আসলে ন্যানোর মৃত্যু ঘটেছে বাজার সঙ্কটের অনিরসনীয় রোগে। সিঙ্গুরে ন্যানো হলে এইই ঘটত।

সিঙ্গুরে শিল্প হলে জমিদাতা পরিবার কি সত্যিই চাকরি পেত? পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে যারা জমি দিয়েছেন, তারা কি সত্যিই চাকরি পেয়েছেন? এ বিষয়ে সিপিএম এর মুখপত্র 'গণশক্তি' ১ আগস্ট ২০২১ লিখেছে, এই কারখানায় ১২০০ জমিদাতা পরিবারের মাত্র ১৭৯ জনের কাজ জুটেছে। তার বেশিরভাগই ঠিকাদারের অধীনে। ৪২ জন সরাসরি কোম্পানির ব্যবস্থায় কাজ পেয়েছে। এখন জমিদাতা পরিবারের কর্মরত ৮৫ জনের কাজ ছাঁটাই করে দিয়ে বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে কম বেতনের শ্রমিক এনে কাজ করানো হচ্ছে। সিঙ্গুরে ন্যানো হলে এটা যে ঘটত না তার গ্যারান্টি কী? আগেই বলা হয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তা নিশ্চিত করতে শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার, স্থায়ী শ্রমিকের পরিবর্তে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ, মজুরি কম দেওয়া, বেশি সময় খাটানো ইত্যাদি শ্রমিক বিরোধী নীতি ভারত সহ সব পুঁজিবাদী দেশেই চলছে। সিঙ্গুরে ন্যানো হলে শালবনির ছায়াই পড়ত।

সিঙ্গুরে আন্দোলনকারীরা— বিশেষ করে এস ইউ সি আই (সি) বিকল্প জমির কথা বলেনি, এটাও মিথ্যাচার। এস ইউ সি আই (সি) বলেছিল, সিঙ্গুরের তিন ফসলি জমিতে নয়, শিল্প সম্ভব হলে করা হোক পুরুলিয়া বাঁকুড়ার অনুর্বর জমিতে, জঙ্গলমহলের এক ফসলি জমিতে, অথবা ৫৬ হাজার বন্ধ কারখানার জমিতে বা এস ই জেড এর জন্য অধিগৃহীত জমিতে। কিন্তু তৎকালীন সিপিএম সরকার এসব প্রস্তাবে কান দেয়নি। বিজেপির 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গের' মতো সিঙ্গুরের ওই জমিতেই শিল্প হবে— এই অনড় মনোভাবই পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালের মধ্যস্থতায় স্থির হয়, এক হাজার একর নয়, ৪০০ একর জমিতে শিল্প হবে। আন্দোলনকারীরা তা মেনেও নেয়। এই রাজভবন চুক্তির পর বেশি লোভনীয় অফার পেয়ে হঠাৎ টাটারা সিঙ্গুর ছেড়ে গুজরাটের সানন্দে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে। ফলে তাদের চলে যাওয়ার দায় আন্দোলনকারীদের উপর বর্তায় কী করে?

সংগ্রামী স্পর্ধায় সমুন্নত

এগারোর অনুভূতি

ফি-বৃদ্ধি রোধ, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে স্কুল-কলেজ খোলা সহ নানা দাবিতে ২৬ জুলাই রাজ্য জুড়ে প্রতীকী অবরোধের ডাক দেয় এআইডিএসও। বাঁকুড়ায় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় জেলবন্দি করে পুলিশ। প্রতিবাদে উত্তাল হয় ছাত্রসমাজ। ৩১ জুলাই মুক্তি পেয়ে বন্দি ওই ১১জন শিক্ষার্থী তুলে ধরেছেন তাঁদের অনুভূতি ঃ

শাসকের ষড়যন্ত্রে অবরুদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্গল উন্মুক্ত করতে, মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'জ্ঞান'কে লুঠেরাদের হাত থেকে রক্ষা করতে এই বাংলার হাজার হাজার সংগ্রামী সাথীদের সাথে আমরাও সেদিন শাসক তথা শোষণতন্ত্রের ধমনীগুলোকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলাম। মাত্র এক ঘন্টার যুদ্ধে হাঁসফাঁস করে উঠেছিল ওরা। সীমাহীন আতঙ্কে জান্তব ঔদ্ধত্যে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উন্মত্ত হিংসায়।

আমরা শুনেছিলাম বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র উদাত্ত আহ্বান, যে প্রত্যয়পূর্ণ সুর একদিন এ দেশের নবজাগরণ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল।

এই বাংলার হাজার হাজার সংগ্রামী সাথীদের সাথে সেই ধ্বনির অনুরণন উঠেছিল আমাদের বুকেও। হ্যাঁ, খরাপীড়িত, দারিদ্র অধ্যুষিত, প্রত্যন্ত নগরী বাঁকুড়ার আমরা এগারো জন। যারা শাসকের ষড়যন্ত্রে অবরুদ্ধ হয়েছি কারাগারে।

বাইরে বাকি লড়াইয়ের ইতিহাস রচনা করলেন যাঁরা, তাঁরাই আমাদের অভিনন্দিত করলেন পুষ্পে মাল্যে। বিভূষিত করলেন 'বীর' আখ্যায়। প্রাপকের যোগ্যতা আর দাতার উদারতার মাঝে সাত সমুদ্রের ব্যবধান, তবুও তা দ্বিধা-সংকোচে বিহ্বল করেনি আমাদের। বরং তা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে সুমহান কর্তব্যের আহ্বান।

মুক্তি যন্ত্রণায় ছটফট করা এই পচনশীল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নিত্য যেখানে মানবতার অপমৃত্যু ঘটছে, যেখানে জনশ্রুতি চলে 'কেউ ভালো নয়', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'— সেই সমাজের গর্ভে আজও শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সত্যসাধক মানবাত্মার স্রোতধারা ফল্গুধারায় প্রবাহিত হতে দেখলাম আমরা। এ কি আমাদের কম পাওয়া! এই তো আমাদের আশীর্বাদ!

আমরা যখন কারান্তরালে, বহির্জগতথেকে পরিপূর্ণ সংযোগহীন, তখন আমরা বুক ভরা ভালোবাসা পেয়েছি কারারুদ্ধ মানুষের কাছথেকে। 'চোর-ডাকাত' বলে সমাজ যাঁদের ঘৃণা করে তাঁরাই আমাদের বুকে করে আগলে রেখেছিলেন কারান্তরালের ওই দিন কটি। লৌহকারার শৃঙ্খলিত জীবন যাঁরা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছেন সকলের সাথে তাঁরাও আমাদের মুক্তির জন্য দিন গুনেছেন। তাঁদের অসহায় জীবন, চোখের জল আমাদের কাছে আগামী দিনের পথ চলার চির সম্পদ হয়ে থাকবে। তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থ-মুক্ত ভালোবাসা আমরা চিরদিন মাথায় করে রাখবো। আমরা সেলাম জানাই তাঁদের।

আমরা পেলাম এমন একদল মানুষকে যাঁরা মানবাধিকার রক্ষার জন্য এই দুঃসময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সরেজমিনে তদন্ত করে সমাজের কাছে তুলে ধরলেন প্রকৃত সত্য। কুর্নিশ জানাই তাঁদেরও।

আমরা পেলাম সংগ্রামী চেতনার পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্যবাহী বাঁকুড়া কোর্টের একদল উন্নতশির আইনজীবীকে।

যখন সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক তাপসী মালিকের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় আন্দোলনকারী ২৯টি সংগ্রামী প্রাণকে বদ্ধ করা হয়েছিল কারাগারে, তখন তাঁদের পক্ষে শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এই কোর্টের আইনজীবীরাই।

যখন পথনাটিকার মাধ্যমে শোষণযন্ত্রের নগ্নতা উন্মোচনের অপরাধে শহরের বুদ্ধিজীবীরা হয়েছেন কারাবন্দি, তখনো তাঁরাই দাঁড়িয়েছেন পাশে।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, ১৯২৫-এ যখন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এ জেলায় এসে 'বিপ্লবী ইস্তেহার' প্রচার করতে গিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন, তখন এ জেলার তৎকালীন আইনজীবীরাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, লড়েছেন। আজও প্রবাহমান সেই ধারার স্পর্শে আমরা গর্বিত, প্রাণিত। আমরা সেলাম জানাই তাঁদেরও।

অগণিত ছাত্র যুবক শিক্ষক অধ্যাপক চিকিৎসক সহ সাধারণ মানুষ যাঁরা আমাদের মুক্তির দাবিকে সোচ্চারে সমর্থন জানিয়েছেন। সর্বত্র আলাপে আলোচনায় আমাদের লড়াইয়ের ন্যায্যতার স্বপক্ষে এই নগরীর পরিবেশকে সংগ্রামমুখর করে তুলেছেন, যা শাসকের বুকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা সেলাম জানাই তাঁদেরকেও।

গল্পে, উপন্যাসে, বিপ্লবী কাহিনীতে আমরা অনেক মাতা-পিতার কথা শুনেছি, যাঁদের বীরগাথা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা আমাদের অভিভাবকদের নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করে গর্বিত হয়েছি। তাঁরা শুধু তাঁর নিজ সন্তানের জন্য নয়, সকল সন্তানের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। আমরা পেয়েছি এমন পিতাকে যিনি তাঁর সন্তানকে লিখে জানিয়েছেন, 'পরিবারের পক্ষ থেকে তোমার সংগ্রামকে অভিনন্দন।' এ যে আমাদের কত বড় শক্তি, মূল্যবান পাথেয়— তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন! আমরা সেলাম জানাই তাঁদেরকেও।

আমরা সেলাম জানাই সেই বিপ্লবী সাথীদের, কমরেডদের যাঁরা এই যুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বুকে বহন করে শাসকের বর্বরতাকে উপেক্ষা করে, রক্তাক্ত হয়ে, কারারুদ্ধ হয়ে সমগ্র বাংলাকে পুনর্জাগরিত করেছেন। তাঁদের বিপ্লবী হৃদয়াবেগ, বিপ্লবী বন্ধুত্বের হৃদয়স্পর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা লাল সেলাম জানাই তাঁদের।

সংগ্রামী অভিবাদন সহ

আমরা এগারো জন

প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল। কমিউন গুণগত ভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কমিউন শাসনে এই প্রথম শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ৭২ দিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কমিউনকে ধ্বংস করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মানবমুক্তির দিশারী কার্ল মার্ক্স তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন, সমৃদ্ধ করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য-প্রয়োজন। প্যারি কমিউনের এই মহান সংগ্রামের ইতিহাস জানা সমস্ত মার্কসবাদীর অবশ্য-কর্তব্য। এ বার অষ্টম তথা শেষ কিস্তি।

— সম্পাদক, গণদাবী

৮

শাসক বুর্জোয়ারা, যারা বিপ্লবের আগে ছিল শোষক, তারা সব সময়ই চেষ্টা করবে বিপ্লবকে পরাস্ত করতে। সেই কারণে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই প্রয়োজন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণির সঞ্চিত ধনদৌলত শ্রমিক-জনতার করায়ত্ত করা। সে কারণে প্রয়োজন ছিল ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সকে কমিউনের দখলে আনার। অন্তত অপর একটি কারণেও ব্যাঙ্ক দখলের প্রয়োজন ছিল। এঙ্গেলস যথার্থই বলেছেন, এ কাজটি সম্পন্ন করতে অগ্রসর হলেই সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণি, আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনায় ভীত হয়ে ভার্সাইয়ের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের ওপর কমিউনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য চাপ দিত আর সে অবস্থান তখন কমিউন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে কাজে লাগাতে পারত। কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে এঙ্গেলস দেখালেন, "শুরু থেকেই কমিউন মানতে বাধ্য হল, ক্ষমতা দখলের পর শ্রমিক শ্রেণি পুরোনা শাসনযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না। যে আধিপত্য শ্রমিক সদ্য জয় করে নিয়েছে, তাকে আবার হারাতে না হলে, একদিকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে সকল সাবেকি নিপীড়ন যন্ত্রকে, এতকাল যা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অন্য দিকে তেমনই তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রতিনিধি ও সরকারি পদাধিকারীদের হাত থেকেও— এই বিধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের প্রত্যেককে যে কোনও মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে।" মার্ক্স বললেন, "কমিউন বিশেষভাবে একটা জিনিস প্রমাণ করেছে, তা হল, শ্রমিক শ্রেণি রেডিমেড রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে সুবিধা আদায় করতে পারে না, এবং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না।" এই যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার অভাবই কমিউনের পতনের বহু কারণের মধ্যে অন্যতম।

মার্ক্স ধারাবাহিক ভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনগুলিকে লক্ষ করেছিলেন এবং তার মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের রূপটিকে, তার পরিবর্তনগুলিকে, বিকাশকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। কমিউনের পরাজয়ের কয়েক দিনের মধ্যে তিনি 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' বইটি লেখেন। লেখেন 'ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রাম' এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'। ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলির বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি প্রয়োগের চমৎকার নিদর্শন এগুলি। এই সব রচনার মধ্যে তিনি শ্রমিক শ্রেণির দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করেন এবং তার থেকে উত্তরণের উপায়গুলি বর্ণনা করেন। মার্কসবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে যারা বিকৃত করার চেষ্টা করছিল সেই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর বিখ্যাত দলিল 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' বইটিতে মার্ক্স একটা রাজনৈতিক উত্তরণ পর্বের প্রয়োজনীয়তা ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা দেখান, যে পর্বে রাষ্ট্রকে অবশ্যই হতে হবে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

প্যারি কমিউনের অনেক বছর পর লেনিন বার বার ফিরে তাকিয়েছেন প্যারির শ্রমিকদের অভূতপূর্ব সংগ্রামের দিকে। তিনি কমিউনের সংগ্রামকে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করেছেন, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামকে ক্ষুরধার করেছেন। লেনিন বলেছেন, "সর্বহারা শ্রেণি মাঝপথেই থেমে গিয়েছিল। শোষকদের দমন না করে, অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্যের ভিত্তিতে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে উন্নত ধরনের ন্যায় প্রতিষ্ঠার খোয়াব দেখে কমিউন নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। ... শত্রুদের ধ্বংস করার বদলে নৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল।"

কমিউনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার অভাব। শ্রমিকশ্রেণির যথার্থ বিপ্লবী দল তখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য নেতৃত্ব ছিল না। আন্তর্জাতিকের শাখা ছিল প্যারিসে এবং আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় সংস্থার বহু যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যও ছিলেন কমিউনে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বহু সদস্যই ছিলেন ব্ল্যাঙ্কি অথবা প্রুধোঁর তত্ত্বে বিশ্বাসী। উভয় তত্ত্বই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুসারী নয়। আন্তর্জাতিকের যে অংশ ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী চিন্তার ধারক ও বাহক, কার্ল মার্কসের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে যাঁরা আস্থাবান ছিলেন, কমিউনে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য এবং তখনও এই অংশ প্যারিসে যথার্থ বিপ্লবী দলে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় অভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব যে কমিউনে প্রকট হবে তা খুবই স্বাভাবিক।

কমিউনের সদস্যদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ ছিল উদারনৈতিক রিপাবলিকান পেটিবুর্জোয়া যারা নয়া জ্যাকোবিন নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথার্থ আপসহীন সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং সংগ্রামী জনতার কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেও পরিগণিত হয়েছেন যেমন, দেলেসক্লুজ। তবে মূলত পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীসুলভ মনোভাবের প্রাধান্যের দরুন চিন্তার দিক থেকে এঁরা বুর্জোয়া চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। নিঃসন্দেহে সেটা বুর্জোয়া চিন্তাধারার বর্তমান যুগের ক্ষয়িষ্ণু রূপ নয়, বরং বুর্জোয়া চিন্তার প্রথম যুগের ধারা, যে ধারা ছিল আপসহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী, ছিল চিন্তার দিক থেকে সেকুলার এবং যার ভিতরে ছিল যৌবনের অদম্য প্রাণোচ্ছ্বাস। তারই প্রভাব ছিল এদের উপর। তা সত্ত্বেও এ কথা মনে রাখা দরকার যে এ চিন্তার সঙ্গে মেহনতি মানুষের পক্ষে, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব সমাধা করে শোষণহীন সমাজ পত্তনের চিন্তার ছিল একটা বিরাট ফারাক। স্বাভাবিক কারণেই যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে কমিউন এসেছিল, বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল না।

এঙ্গেলস বলেছেন, "... সেই জন্য বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউন অনেক কিছুই করেনি যা এখন আমাদের মতে করা উচিত ছিল। ... ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের নিয়ে গঠিত হলেও এই কমিউন যা করেছিল তার অনেক কিছুর নির্ভুলতাই হল অনেক বেশি বিস্ময়কর।" মার্ক্স বললেন, "যে শ্রেণি-সম্পত্তি বহুর শ্রমকে পরিণত করে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদে, তাকে কমিউন উচ্ছেদ করতেই চেয়েছিল। উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ ছিল তার লক্ষ্য। উৎপাদনের উপায়, জমি ও পুঁজি, আজ যেটা মুখ্যত শ্রমকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন এবং শোষণের উপায় মাত্র, তাকে মুক্ত ও যৌথ শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে চেয়েছিল কমিউন।"

যথার্থ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী চিন্তা তখনও ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আদর্শ, চিন্তা ও দর্শনগত দিক থেকে মূলত উদারনৈতিক বুর্জোয়া ভাবধারাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল কমিউন প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রে। তবে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রভাবে ও বিরাট সংখ্যায় শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ কমিউনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেগুলো নিঃসন্দেহে সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায় ছিল উজ্জ্বল। অবশ্য এ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরাও খুব সচেতন ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "জাগ্রত জনতার অখণ্ড চেতনাই কমিউনের জন্মদাতা। যাঁরা কমিউন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরাই এর মূল্য বোঝেননি।" লেনিন বললেন, 'সমস্ত ভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিউন উনবিংশ শতাব্দীর সর্বহারা আন্দোলনের অভূতপূর্ব উদাহরণ। ... কমিউনের আত্মত্যাগ সর্বহারার সংগ্রামের সামনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপের বুকে এই সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ... এই সংগ্রাম ছদ্ম দেশপ্রেমের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। ... কমিউন দেখিয়ে দিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণিকে কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

উপরোক্ত আলোচনায় কমিউনের কয়েকটি ত্রুটি, যেমন ভার্সাই আক্রমণ বা ব্যাঙ্ক দখল না করা ইত্যাদিকে সে কারণেই আপাতদৃষ্টিতে কমিউনের পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কমিউন এ কাজগুলো সম্পন্ন করলেই আর তার পতন ঘটত না, এ কথা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। হয়ত তার আয়ুষ্কাল কিছুটা বর্ধিত হতে পারত। কমিউন সার্থকরূপে নাও গড়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই ১৮৭১-এ সেপ্টেম্বর মাসে মার্ক্স সাবধানবাণী উল্লেখ করেছিলেন, "এ সময়ে অভ্যুত্থান ঘটানো বেপরোয়া ও বোকামি হবে।" অবশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলে ন্যায়সঙ্গত কারণেই তাকে অভিনন্দন, সাহায্য ও সমর্থন জ্ঞাপনে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

তাই বহু ত্রুটি বিচ্যুতি, বহু বিভ্রান্তি এবং যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব সত্ত্বেও একথা মনে রাখা দরকার যে, "কমিউন কোনও সংকীর্ণ বা আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে লড়েনি। এর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মেহনতি মানুষের মুক্তি। ... কমিউনের স্বার্থ হল শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন। বিশ্ব সর্বহারার লক্ষ্যও তাই। এদিক থেকে কমিউন অমর হয়ে থাকবে।" মার্ক্স বললেন, "কমিউন-সমেত শ্রমিক শ্রেণির প্যারিস চিরদিন এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে। শ্রমিক শ্রেণির বিশাল হৃদয়ে তার শহিদেরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস তাদের জল্লাদদের ইতিমধ্যেই সেই শাশ্বত শাস্তিমঞ্চে আবদ্ধ করেছে, যেখান থেকে তাদের পুরোহিতদের যাবতীয় প্রার্থনাতেও তাদের নিষ্কৃতি মিলবে না।"

পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নের শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে আজ যাঁরাই বেরোতে চান, দেড়শো বছর পরেও তাঁদের ফিরে তাকাতে হবে প্যারি কমিউনের দিকে। শিক্ষা নিতে হবে যে, পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে না ভেঙে শোষিত মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। নির্বাচনে যতই সরকার পাল্টাক, তার দ্বারা রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাবে না, রাষ্ট্রের শোষণের চরিত্র বদলাবে না। প্যারি কমিউন থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে, পুলিশ-মিলিটারি-বিচার ব্যবস্থা-আমলাতন্ত্রের মজবুত স্তম্ভের দ্বারা শক্তিশালী এই রাষ্ট্র শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে নির্মম ভাবে দমনের চেষ্টা চালাবে। সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করে মানুষের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে হলে শোষিত মানুষের লৌহদৃঢ় ঐক্য দরকার, দরকার ক্ষুরধার শ্রেণিচেতনা, এই চেতনার ভিত্তিতে সত্যিকারর একটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমবেত হওয়া। ভারতে সেই পার্টি একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। এই পার্টিরই রয়েছে সঠিক দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি, রয়েছে সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া নেতৃত্ব। এই পার্টির নেতৃত্ব দেশের সংগ্রামী আন্দোলনগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই একমাত্র সম্ভব পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রের মোকাবিলা করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। *(সমাপ্ত)*

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস পালিত

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে দলের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে অনলাইন সভায় দিনটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এ রাজ্য সহ দেশের কয়েক হাজার মানুষ এই বক্তব্য শোনেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং কমরেড সৌমেন বসু। সারা দেশে দলের রক্তপতাকা উত্তোলন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনার অংশ পাঠের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়।

ঝাড়খণ্ডে লাগাতার ছাত্র আন্দোলনের জয়

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ড একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের নির্মম ও লাগাতার লুঠে দেশের অন্যতম দরিদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যের ছাত্র ও গণআন্দোলনের অন্যতম দাবি সকলের জন্য অবৈতনিক গণতান্ত্রিক বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা। আন্দোলনের চাপে ঝাড়খণ্ডে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকার 'ছাত্রবৃত্তি' প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ই-কল্যাণ পোর্টাল চালু না থাকায় ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বিএড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রবৃত্তির আবেদন করতে পারেনি। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শিক্ষা মাঝপথে থমকে গিয়েছে। ছাত্রবৃত্তি পুনরায় চালু করার দাবিতে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লাগাতার আন্দোলনের পথে নামে এবং ছাত্রবৃত্তি অধিকার মঞ্চ গড়ে তোলে। আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই এ আই ডি এস ও নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেয়। গত পাঁচ মাস ধরে ডেপুটেশন, গণ-ইমেল, কনভেনশন, অনলাইন প্রচার সহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়। কিন্তু সরকার কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। 'ছাত্রবৃত্তি অধিকার মঞ্চ' এবং এআইডিএসও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কল্যাণ মন্ত্রী এবং কল্যাণ সচিব সহ ৩০ জন বিধায়ককে দাবিপত্র দেয়। ১৫ জুলাই সহস্রাধিক ছাত্র রাঁচিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাতে সমবেত হয়। তারপরেও সরকারের কোনও হেলদোল না দেখে এই ভয়াবহ করোনা মহামারী পরিস্থিতির মধ্যেই নিজেদের শিক্ষাজীবন রক্ষার্থে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও ২৬ জুলাই শতশত ছাত্র রাজভবনের সামনে সমবেত হয় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করে। এই বীরত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রাজ্যের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ বিপুল সমর্থন জানান। বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ডঃ গহর রাজা, জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। লাগাতার ও ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলনের চাপে ২৯ জুলাই সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়।

এআইডিএসও ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড সমর মাহাতো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এবং ছাত্রবৃত্তি অধিকার মঞ্চের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে থাকবার অঙ্গীকার করেন। ছাত্রবৃত্তি অধিকার মঞ্চের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবন যাদব আন্দোলনের এই সাফল্যের কৃতিত্ব রাজ্যের সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে উৎসর্গ করেন।

দিল্লির ধর্ষক-খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি এআইএমএসএস-এর

৬ আগস্ট দিল্লিতে মহিলা ও ছাত্রদের মিছিল

আবারও এক নাবালিকা কন্যা ভয়াবহ ধর্ষণের শিকার হয়ে প্রাণ হারাল দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রী ৭৫ বছরের স্বাধীনতা উৎসবের আগে দেশের মেয়েদের জন্য বাণী দিচ্ছেন। আর তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিচালনায় থাকা দিল্লি পুলিশের নাকের ডগায় ৯ বছরের এক কন্যাকে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির পুরনো নাঙ্গাল গ্রামের শ্মশানের পুরোহিত এবং তার শাগরেদরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, দেহটা পুড়িয়ে দিয়েছে সব প্রমাণ লোপাটের জন্য। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীন দিল্লি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেও এফআইআর পর্যন্ত করেনি। খোদ রাজধানীর উপকণ্ঠে এই ভয়াবহ ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা দেশ।

কিন্তু স্থানীয় বিজেপি নেতা ও ধর্ষণকারীদের সাথে মিলে পুলিশ চেষ্টা করছে ঘটনাটিকে 'ইলেকট্রিক শকে' মৃত্যু বলে চালাতে। যদিও মৃত বালিকাটির মা সহ পরিবারের সদস্যরা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন তাঁদের কন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া উত্তরপ্রদেশের হাথরসে বিজেপি সরকারের পুলিশ ঠিক একইভাবে নির্যাতিতা কন্যার দেহ পুড়িয়ে দিয়েছিল চুপিসারে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে সারা দেশে। এই পাশবিক হত্যা এবং ধর্ষণের বিরুদ্ধে এআইএমএসএস ৬ আগস্ট সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করে। সেদিন সারা দেশ জুড়ে মহিলারা স্লোগান তোলেন 'শিশুকন্যাদের রক্ষা করো', ধর্ষক খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি চাই', 'ভার্মা কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে'। দাবি ওঠে, অশ্লীল ফিল্ম-পত্রপত্রিকা-বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করতে হবে, মদ ও মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। এ দিন কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

ত্রিপুরায় গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ

ত্রিপুরার মাটির নিচ থেকে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনে এবং সিলিন্ডারে ভরে সরবরাহ করে সরকার অধিগৃহীত সংস্থা 'ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (টিএনজিসিএল)। সম্প্রতি এই কোম্পানি তাদের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে কেজি প্রতি দু'টাকা এবং পাইপলাইনের ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি ১ টাকা। দীর্ঘ লকডাউন এবং কারফিউ জনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি এখন এমনিতেই শোচনীয়। তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পেট্রল-ডিজেল ও এলপিজি গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে তাতে মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় মানুষ জর্জরিত। এর মধ্যে আবার নতুন করে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ত্রিপুরার মতো দরিদ্র রাজ্যের মানুষকে এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। ৪ আগস্ট দলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরে টিএনজিসিএল সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে দেওয়া স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে সিএনজি সিলিন্ডার ও পাইপলাইন গ্যাসের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে, নিয়মিত মিটার রিডিং না নিয়ে পাইপলাইন গ্যাসের বিল করা চলবে না, কোম্পানির গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করতে হবে।

শিশুদের রান্না করা খাবারের দাবি

ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২৮ জুলাই বীরভূমে শতাধিক আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকা জেলা প্রোজেক্ট অফিসারের (ডিপিও) কাছে স্মারকলিপি দেন। তাদের দাবি, গণ পরিবহণ সচল রেখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করা গরম খাবার দিতে হবে, কেন্দ্রগুলিকে স্যানিটাইজ করতে হবে, এসএনপি-র বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, জ্বালানি বাবদ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। যতক্ষণ না রান্না করা খাবার চালু হচ্ছে ততক্ষণ এসএনপি-র পরিপূরক খাবার দিতে হবে, সমস্ত কেন্দ্রে শিশুদের ওজন মাপার মেশিন দিতে হবে, ২০১৪ সাল থেকে বসে যাওয়া কর্মী-সহায়িকাদের সরকার ঘোষিত তিন লক্ষ টাকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে, কর্মরত অবস্থায় কোনও কর্মী মারা গেলে তার পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ডিপিও বলেছেন, তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য নেত্রী জলি চ্যাটার্জী এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র বীরভূম জেলা সম্পাদিকা আয়েষা খাতুন। হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগণাতেও একই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com